একক ৬ ❑ পাঠক্রমের ধারণা (Concept of Curriculum)

গঠন

৬.১ সূচনা

৬.২ উদ্দেশ্য

৬.৩ পাঠক্রমের ধারণা

৬.৪ পাঠক্রমের সংজ্ঞা

৬.৫ পাঠক্রম সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী

৬.৬ পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য

৬.৭ পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম

৬.৮ পাঠক্রমের প্রকারভেদ

৬.৮.১ গতানুগতিক বা বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম

৬.৮.২ কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম

৬.৮.৩ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম

৬.৮.৪ অবিচ্ছিন্ন বা সমাকলিত পাঠক্রম

৬.৮.৫ জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম

৬.৯ শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের ভূমিকা

৬.১০ উপসংহার

৬.১১ প্রশ্নাবলি

৬.১ সূচনা (Introduction)

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ও উন্নয়নে সাহায্য করা। শিক্ষার এই লক্ষ্যে পৌঁছতে যে তিনটি প্রধান উপাদান দরকার সেগুলি হল—শিক্ষার্থী, পাঠক্রম ও শিক্ষক। এই পাঠক্রম ব্যক্তি ও সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষণ-প্রক্রিয়া এবং

মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া সংগঠিত করে। দেশ, কাল ও দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে এই পাঠক্রমের প্রকারভেদেরও বিভিন্নতা দেখা যায়। আসলে পঠনপাঠন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার সুপরিকল্পিত পন্থার পাঠক্রমকে অনেকে আবার বিষয়বস্তুর সমাহার বলে অভিহিত করে থাকেন। এই এককে পাঠক্রমের একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কীভাবে বিভিন্ন প্রকারের পাঠক্রম সৃষ্টি ও ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি বিষয়ের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে, শিক্ষার্থীরা—

- পাঠক্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- পাঠক্রম সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পাঠক্রমের প্রকারভেদের সম্যক ধারণা লাভ করবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের ভূমিকার রূপরেখা টানতে পারবেন।

৬.৩ পাঠক্রমের ধারণা (Concept of Curriculum)

শিক্ষা কার্যক্রমের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠক্রম। শিক্ষা কার্যক্রমে লক্ষ্য নির্ধারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানা দরকার কার্যক্রমে পাঠক্রমটি কী হবে? এই পাঠক্রমই শিক্ষার্থীকে শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আসলে উপযুক্ত পঠনপাঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুপরিকল্পিত গতিশীল প্রক্রিয়া হচ্ছে পাঠক্রম। অনেকে পাঠক্রমকে 'জ্ঞান সামগ্রী' বলে থাকেন।

বাংলায় যে কথাটিকে বলা হয় 'পাঠক্রম' ইংরেজিতে সেটিই হল কারিকুলাম (curriculum)। ব্যুৎপত্তিগত দিক আবার অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে ইংরেজি কারিকুলাম শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ CURRER থেকে। যার অর্থ হচ্ছে দৌড় (RACE)। আর কারিকুলাম (CURRICULUM)

শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর গতিপথ (course to be run for reaching a certain goal) অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে 'কারিকুলাম' কথা ব্যবহার করে শিক্ষা কার্যক্রমকে দৌড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয় যার শেষ পর্যায় হল শিক্ষার লক্ষ্য (aim of education)। শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিতভাবে পূর্বনির্ধারিত গতিপথের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ পাঠক্রম হল শিক্ষার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর গতিপথ।

মধ্যযুগে 'পাঠক্রম'-কে 'জ্ঞানভিত্তিক' ধারণা হিসেবেই বিবেচিত করা হত। ফলে প্রাথমিক পর্বে পাঠক্রম গুরুত্ব পেয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে তাত্ত্বিকজ্ঞানের ও তার বিন্যাসের ওপর। কিন্তু পরবর্তীকালেও দার্শনিক ভিত্তির সঙ্গে পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য, মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে শিক্ষার লক্ষ্য যেমন জীবনাদর্শ ও সমাজদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি 'পাঠক্রম' আবার শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকে ব্যক্তিসত্তা, প্রকৌশল ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সুনিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর এই সমস্ত উপাদান ও পরিমণ্ডল একে অন্যের পরিপূরক হয়ে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, তাই পাঠক্রম একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। উপযুক্ত গতিশীল পাঠক্রমই পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তির চাহিদার পরিতৃপ্তির মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনের গুণগতমানের উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে।

পাঠক্রম নিয়ে শিক্ষাবিদরা বিভিন্নভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন। তবে চতুর্দশ শতাব্দীতে শিক্ষাবিদদের গবেষণার ক্ষেত্রে এর বিশেষ গুরুত্বলাভ ঘটে। এই সময়ে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (Plato) পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ দিয়েছিলেন। পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে কমিনিয়াস (Comeneius) এই মতবাদের উপযুক্ত প্রয়োগ পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে ঘটান। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাস্ক (Rusk), ফ্রয়েবেল (Froebel) প্রমুখ শিক্ষাবিদরা পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে নানান বিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেন। অবশ্য পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ঊনবিংশ (১৭৭৬-১৮৪১) শতাব্দীতে হার্বার্ট (Herbert) এর মতবাদ ও তত্ত্ব এক নতুন দিকের সূচনা করে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে পাঠক্রমের উন্নয়ন ও পর্যালোচনার ওপর শিক্ষাবিদরা বিশেষ গুরুত্ব দেন। তার জন্য দেশে ও বিদেশে নানা শিক্ষা কমিশন হয়। এইসব কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য, মূল কাঠামো, পরিচালনা ব্যবস্থা স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তন ঘটেছে কারিকুলাম-এর ধারণাগত ভিত্তি ও বাস্তব রূপায়ণ প্রক্রিয়ার।

৬.৪ পাঠক্রমের সংজ্ঞা (Definition of Curriculum)

'পাঠক্রম' নিয়ে নানা বিশ্লেষণ শিক্ষাবিদরা করেছেন। আর সেইমত শিক্ষাবিদরা ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এরকম কয়েকটি সংজ্ঞা নীচে উল্লেখ করা হল—

(১) ফ্রয়েবল (Froebel) বলেছেন, পাঠক্রম হচ্ছে মানবজাতির সার্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এক সমন্বয়ী রূপ (curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race.)

(২) পেনি (Payne)-এর মতে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূলে বিদ্যালয়ে সচেতনভাবে পরিবেশ ও কার্যক্রম সংগঠিত করা হয় তাদের সমবায়ই হল কারিকুলাম (curriculum consists of all the situations that schools may select and consciously organise for purpose of developing the personality of its pupils and for making behaviour changes in them.)

(৩) অ্যানয়মাস (Anoymous) বলেছেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের বিষয়বস্তু, কাজকর্ম ও অভিজ্ঞতার কার্যকরী সমন্বয়ই হল পাঠক্রম।

(৪) ক্রো এবং ক্রো (Crow and Crow) বলেছেন, শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ও বহির্ভূত যে সহায়ক অভিজ্ঞতাপুঞ্জ নির্বাচন করা হয় তাই হল পাঠক্রম (curriculum includes all the learner's experience, in or outside school that are included in programme which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially spiritually and morally).

(৫) এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে যে কারিকুলাম হল বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্টমানের অনুসৃত জ্ঞানমূলক পাঠ্যবিষয়ের সমবায় (Curriculum : A course of study laid down for the students of a university or school, or in a wider sense, schools of certain standard.)।

(৬) মুদালিয়র কমিশন (Mudeliar Commission)-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাঠক্রমকে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটাকে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের কাজের সব অভিজ্ঞতার সমন্বয় যেমন—শ্রেণিকক্ষের পাঠাগারের, পরীক্ষাগারের, কর্মশালায়, খেলার মাঠের অথবা শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের মিথস্ক্রিয়ার সমবায় হিসেবে ভাবা সঠিক

(curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in schools but it includes the totally of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go on schools–in the classroom library, laboratory, workshop, playground and numerous informal contacts between teachers and pupil.)

ভারতে ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশন অনুযায়ী পাঠক্রমকে মানবসম্পদ উন্নয়নের মূলভিত্তি হিসেবে বিবৃত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে পাঠক্রমের দুটি উদ্দেশ্য-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথম উদ্দেশ্যটি হল, শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশ, উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা (Human resource development)। দ্বিতীয়টি হল, শিক্ষার্থীর সামাজিক ও বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে উপযুক্ত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ ঘটানো। এই দুটি উদ্দেশ্য একে অন্যের পরিপূরক ও পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

৬.৫ পাঠক্রম সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি (Traditional and Modern Approaches of Curriculum)

প্রাচীনকালে পাঠক্রমকে জ্ঞান ও তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর সমাহার বলে বিবেচনা করা হত। তাই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় পাঠক্রম বিশেষভাবে 'জ্ঞানভিত্তিক' লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রস্তুত করা হয়। এই সময় চিন্তাবিদরা মনে করতেন শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার উন্নয়ন শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা সম্ভব। তাই পাঠক্রম প্রস্তুত করার সময় মানসিক বৃত্তি ও প্রবণতার বিকাশের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত জ্ঞান সামগ্রী নির্বাচন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর চিন্তন ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তখন নীতিশাস্ত্র, অঙ্ক ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়। তেমনি যোগাযোগ ক্ষমতা ও সামাজিক অভিযোজনের উদ্দেশ্য ভাষা, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেবার কথা বলে। আবার পরিবেশ ও সত্যকে জানার উদ্দেশ্যে এই ধরনের পাঠক্রমে বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ ও অনুশীলন প্রয়োজন বলে বিবেচিত।

প্রাচীনকালে শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করতেন মানুষের মন কতকগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ মানসিক ক্ষমতা বা শক্তি (faculty) দ্বারা গঠিত। পাঠক্রমের সাহায্যে মানুষের ক্ষমতা ও প্রবণতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব। তাই পাঠক্রম প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এমনভাবে বিষয় নির্বাচন প্রয়োজন যার দ্বারা মানসিক ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। শিক্ষা-সংক্রান্ত এই নীতিকে মানসিক শৃঙ্খলাবোধ নীতি বলা হয় (theory of

formal discipline)। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ। এই ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রম হল শিক্ষা কার্যক্রমের জ্ঞানমূলক পাঠ্যবিষয়ের সমাহার।

প্রাচীন বা গতানুগতিক আদর্শে প্রস্তুত পাঠক্রম মানুষের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক জীবনে বিশেষ কাজে লাগে না বলে আধুনিক শিক্ষাবিদরা এই পাঠক্রমের মূল ধারণাগত ভিত্তির বিশেষ পরিবর্তন ঘটান। আধুনিক চিন্তাবিদদের মতে পাঠক্রমকে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। আধুনিককালে চিন্তাবিদরা মনে করেন পাঠক্রম শুধুমাত্র জ্ঞানভিত্তিক না করে একদিকে যেমন ব্যক্তির বিকাশ ও উন্নয়নের উপর জোর দেবে অন্যদিকে শিক্ষার্থীর সামাজিক প্রক্রিয়াকরণেও জোর দেবে। তাই এই দুই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে পাঠক্রমের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করার সঙ্গে জীবন, জীবিকা ও সামাজিক অভিযোজনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানো বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। এই ধরনের সর্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ই হল পাঠক্রম। তাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাঠক্রম শুধুমাত্র সংকীর্ণ জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ নয়। এই পাঠক্রমকে ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক বিকাশে সহায়ক, (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে) উপাদান ও অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সমন্বয় হিসেবে ধরা হয়।

পাঠক্রমের প্রাচীন ও আধুনিক ধারণা সম্বন্ধে আধুনিককালে শিক্ষাবিদরা ৫টি পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। এগুলো নিম্নের ছকে বর্ণনা করা হয়েছে—

প্রাচীন ধারণা	আধুনিক ধারণা
১। শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক বিকাশ শিক্ষার মূল লক্ষ্য।	১। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটানো শিক্ষার মূল লক্ষ্য।
২। ঊর্ধ্বক্রমে জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুই প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত।	২। পাঠক্রমের উপাদান হিসেবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, সামাজিক, সৃজনীমূলক ও বৃত্তিমূলক কার্যাবলির সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন।
৩। পঠনপাঠন প্রক্রিয়া মূলত শিক্ষক নির্ভর।	৩। পঠনপাঠন প্রক্রিয়া মূলত শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমের ভিত্তিতে সংগঠিত করা।
৪। পাঠক্রম পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তিত।	৪। পাঠক্রম গতিশীল ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল।
৫। পাঠক্রম তাত্ত্বিক আর্দশের ভিত্তিতে প্রস্তুত হওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া যায়।	৫। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর বাস্তব পরিবেশ ও জীবনকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সংযোজিত।

৬.৬ পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Curriculum)

প্রাচীন বা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে যেসব পাঠক্রম আজকের শিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষভাবে সমাদৃত সেইসব পাঠক্রমে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) পাঠক্রমের মূল কাঠামো শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই পাঠক্রমে এমনভাবে বিষয়বস্তু, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করা হয় যাতে পাঠক্রমটি শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে।

(২) পাঠক্রমের লক্ষ্য কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশে সীমাবদ্ধ নয়। তার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও জীবিকা অর্জনের সহায়ক উপাদানের বিন্যাস ঘটিয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করা। তাই পাঠক্রমে এইসব বিভিন্ন উপাদানের কার্যকরী সমন্বয়সাধনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৩) পাঠক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে পুথিগত বিদ্যা বা তাত্ত্বিকজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীর 'ব্যবহারিক জীবন ও সৃজনী প্রতিভার সঠিক মেলবন্ধন ঘটানো। অর্থাৎ পাঠক্রমে যেমন তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর গুরুত্ব থাকবে তেমনি সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে তাত্ত্বিকজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক উপযোগিতার ও নিজস্ব উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ওপর।

(৪) আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন, আর্থসামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, উন্নয়নের পরিবর্তনশীল গতি ও প্রেক্ষাপটে শিক্ষার লক্ষ্যের নিরন্তর বিবর্তন ঘটেছে। তাই পরিবর্তনশীল জগতে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের সহায়ক বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতা নিরন্তর পাঠক্রমে সংযোজিত হয়। ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির চাহিদার ভিত্তিতে পাঠক্রমের মূল ধারণার বিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পাঠক্রম একটি প্রবাহমান ও গতিশীল প্রক্রিয়া।

(৫) পাঠক্রমের বিষয়বস্তুগুলো একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও একে অন্যের পরিপূরক।

(৬) পাঠক্রমের সার্থকতা ও যৌক্তিকতা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর ওপর বা তার শিখনের ওপর নির্ভর করে না। কোনো পাঠক্রমের সফলতা যেমন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল তেমনি শিক্ষার মূল লক্ষ্য, শিক্ষণের পরিবেশ, শিক্ষণ উপকরণ, সম্পদ, পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সমানভাবে নির্ভরশীল। তাই কোনো পাঠক্রমের কার্যকরী

সফলতা আনার উদ্দেশ্যে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য, বিষয়বস্তু উপকরণ, শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় ও মেলবন্ধন ঘটানো উচিত। ফলে জ্ঞানভিত্তিক পঠনপাঠন প্রক্রিয়ার চেয়ে আধুনিক 'পাঠক্রমের' সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি ব্যবহারিক উপযোগিতা ও যথার্থতা বৃদ্ধির সহায়ক।

(৭) পাঠক্রম শুধুমাত্র শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর উদ্যোগ ও প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে না। পাঠক্রমের সফলতা নির্ভর করে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বিভিন্ন লোকের ইচ্ছে, আগ্রহ ও অংশের ওপর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কার্যকরী অংশগ্রহণের সঙ্গে পাঠক্রমের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষার নীতিনির্ধারক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, উপকরণ নির্মাতা ইত্যাদি নানান জনের ওপরে। এদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও কার্যকরী অংশগ্রহণ পাঠক্রমের স্থায়িত্ব ও উপযোগিতা বাড়াতে সাহায্য করে।

(৮) পাঠক্রমে যে সমস্ত বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার সংযুক্তিকরণ হয় তা সবসময় শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করা সম্ভব হয় না। তাই পাঠক্রমের কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন করা হয়। অর্থাৎ পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—(১) শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা এবং শ্রেণিকক্ষের বহির্ভূত অভিজ্ঞতা।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষার মূল লক্ষ্য বিষয়বস্তু, উপকরণ, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ ও নিরন্তর গতিশীল প্রক্রিয়াই হচ্ছে পাঠক্রম। পাঠক্রম শুধুমাত্র শিক্ষার্থী বা শিক্ষক নির্ভর কার্যক্রম নহে। এতে বহু ধরনের ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এরই পাশাপাশি মনে রাখা প্রয়োজন পাঠক্রমের সফলতা নির্ভর করে সঠিক পাঠ্যসূচি ও পাঠের ওপর।

৬.৭ পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম (Lesson, Syllabus and Curriculum)

পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ। শিক্ষার লক্ষ্য দু-রকমের হতে পারে—চরম লক্ষ্য ও তাৎক্ষণিক লক্ষ্য। আমরা জানি শিক্ষার চরম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো এবং এই উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো। এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। এর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে এগোতে হয়। এই ধাপগুলোর জন্য নানা কোর্স তৈরি করা

হয়। এই কোর্সগুলোকে শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আর সেইমতো নানা কোর্সের জন্য লক্ষ্য অনুযায়ী পাঠক্রম প্রস্তুত করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

সাধারণত পাঠক্রমের যেসব বিষয় বা অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাকেই পাঠ্যসূচি বলা হয়। যেমন—ক্লাস ওয়ানে আমরা দেখি যে সেই পাঠক্রমে রয়েছে অঙ্কের পাঠ্যসূচি আর বাংলার পাঠ্যসূচি। এই পাঠ্যসূচিগুলিই ক্লাস ওয়ানের চরম লক্ষ্যের সহায়ক উপাদান। এই সমস্ত পাঠ্যসূচি ক্লাস ওয়ানের মূল পাঠক্রমের অংশবিশেষ।

পাঠ্যসূচি আবার বহু সংখ্যক একক পাঠের সমন্বয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই পাঠগুলি শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। কয়েকটি তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে আবার পাঠ্যসূচির লক্ষ্য স্থির। স্বল্পমেয়াদী ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের এইসব পাঠ শেষ হলে পাঠ্যসূচির লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় যা পরবর্তীকালে পাঠক্রমকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

নীচের চিত্রে পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রমের সম্পর্ক দেখানো হল ঃ—

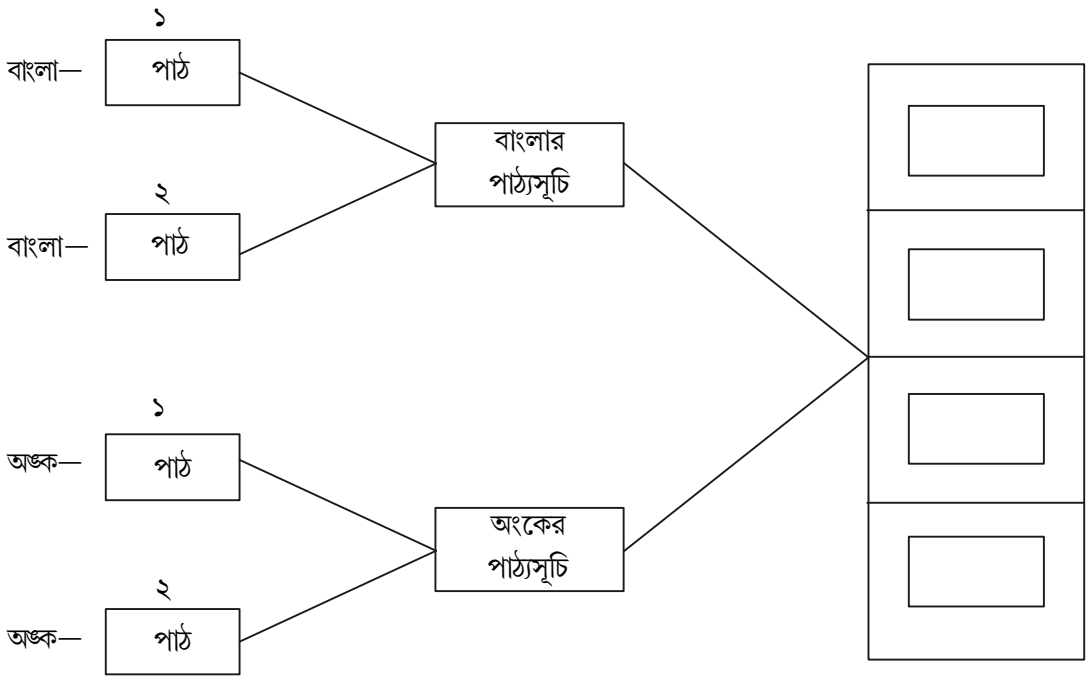

চিত্র ১.১-এ পাঠ → পাঠ্যসূচি → পাঠক্রম-এর সম্পর্ক।

চিত্র ১.১ পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হল। পাঠ্যসূচি বহু সংখ্যক পাঠের সমষ্টি এবং পাঠক্রম কিছু সংখ্যক পাঠ্যসূচি ও কোনো কোনো সময় পাঠ্যসূচি বহির্ভূত অভিজ্ঞতার সমন্বয়। এই তিনটি স্তরে বিষয়বস্তু, সময়কাল লক্ষ্য অনুযায়ী গুণগত ও পরিমাণগত দিকে পার্থক্য রয়েছে। নীচের চিত্রে তা তুলনামূলকভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হল।

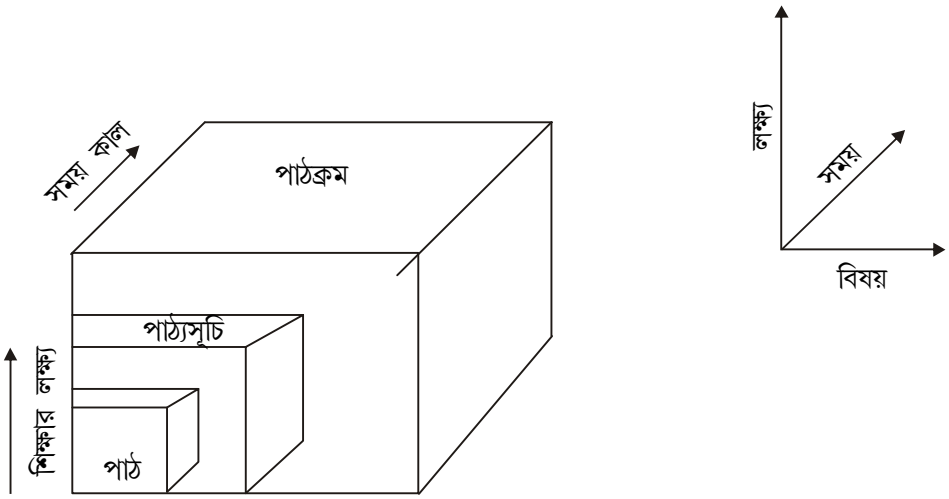

চিত্র ১.২ পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রমে শিক্ষার লক্ষ্য ও সময়কালের তুলনামূলক চিত্র।

ওপরের চিত্র থেকে আমরা দেখতে পাই পাঠক্রমের ধারণা হচ্ছে পাঠ ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য ও সময়কালকে সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস ও সমন্বয়সাধন করার ওপর নির্ভর করছে। পাঠক্রমের লক্ষ্য, বিষয় ও সময়, পাঠ ও পাঠ্যসূচির লক্ষ্য, বিষয় ও সময়কালের ওপর নির্ভর করে।

৬.৮ পাঠক্রমের প্রকারভেদ (Types of Curriculum)

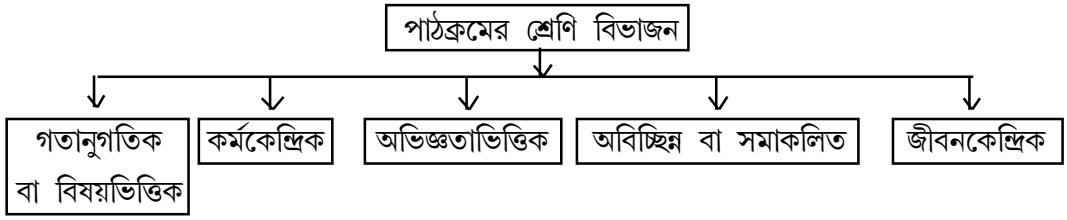

চিত্র ১.৩ পাঠক্রমের প্রধান শ্রেণি বিভাজন

প্রথাযুক্ত (formal) বা প্রথাবহির্ভূত (non formal) যে-কোনো শিক্ষা কার্যক্রমেরই একটি নিজস্ব লক্ষ্য থাকে। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা ও জীবন আর্দশের প্রেক্ষাপটে এই দুই শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুর নানা বিবর্তন ঘটেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ও চাহিদা অনুযায়ী গড়ে উঠেছে নানা রকমের পাঠক্রম। ওপরের চিত্রে ১.৩ এই ধরনের পাঠক্রমের নমুনা দেখানো হল। নীচে এই প্রকারভেদগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৬.৮.১ গতানুগতিক বা বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম (Traditional or Subject Centred Curriculum)

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম সবচেয়ে পুরাতন ও বহুল ব্যবহৃত পাঠক্রম। সুদূর প্রাচ্যের গ্রিসে ও রোমে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই ধরনের পাঠক্রমের চিন্তাভাবনা ও প্রচলন শুরু হয়। এই পাঠক্রমে প্রধানত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রমে শিক্ষকেরা পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান দান করেন আর ছাত্ররা শ্রেণিকক্ষের পঠনপাঠনের সাহায্যে এই জ্ঞান গ্রহণ করে থাকে। যুগযুগ ধরে প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে এই ধরনের পাঠক্রমের ব্যবহার হয়ে চলেছে। এই পাঠক্রমের সফলতা ছাত্রের জ্ঞান আহরণ করার গুণগতমানের ওপর নির্ভর করে। ফলে পাঠক্রমের সফলতা ছাত্রের স্মৃতি ও বুদ্ধি এই দুই মানসিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল।

এই ধরনের পাঠক্রমের ধারণাগত ভিত্তি প্রাচীন শিক্ষাবিদদের মতানুসারে মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বের (Theory of formal discipline) ওপর নির্ভর। এই তত্ত্বে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদরা মনে করেন মানুষের মন কতকগুলি প্রাথমিক বৃত্তি (Faculty) বা ক্ষমতা দিয়ে তৈরি। পাঠ্যবিষয়ের উপযুক্ত বিষয়বস্তু মনের কোনো বিশেষ ক্ষমতা বা বৃত্তিকে বিকাশ করতে সাহায্য করে। যেমন গণিত বা নীতিশাস্ত্রের ব্যবহার মানুষের যুক্তি শক্তির বিকাশের উৎকর্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে। তেমনি পরিবেশ ও ভূগোল এর বিষয়বস্তু মানুষকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশে সাহায্য করতে পারে। তা ছাড়া এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিশেষ ধরনের পাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনের ক্ষমতার যে বিকাশ ঘটে তা শিক্ষার্থী জীবনের অন্য পরিস্থিতিতেও প্রয়োগ বা ব্যবহার করতে পারবে। অর্থাৎ এখানে মনে করা হয় কোনো বিশেষ পাঠের মাধ্যমে মনের কোনো ক্ষমতার বিকাশ হলে, সেই শক্তি (stimulus) সামগ্রিকভাবে মানসিক বিকাশ ঘটায় এবং এই লব্ধ মানসিক ক্ষমতাই শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধান ও মূল্যায়নে সাহায্য করে।

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমের কার্যকারিতা নির্ভর করে পাঠ্যসূচি ও পাঠের সংগঠনের ওপর। সার্থক পাঠক্রম তখনই প্রস্তুত সম্ভব যদি স্বল্প বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সীমিত সময়ে সহজেই শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা হয়। কতটা শেখানো হবে ও কী শেখানো হবে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটানো হয়। আর এই সমন্বয় ঘটাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাঠক্রমের সংগতি রেখে পাঠ ও পাঠ্যসূচির বিন্যাস ঘটানো হয়।

এই ধরনের পাঠক্রমের সুবিধা হচ্ছে সীমিত সময় ও স্বল্প সংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে অনেক বেশি ছাত্রের সহজে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়। শুধু তাই নয় একই সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীর মূল্যায়নও সম্ভব। এই ধরনের পাঠক্রম পরিকল্পনার সময় শিক্ষকেরা ভাষণ, আলোচনাচক্র ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যক্রম সহজে পরিচালনা করে থাকেন।

● বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমের ত্রুটি (Defects of Subject Centred Curriculum)

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম যেহেতু বহুল ব্যবহৃত পাঠক্রম তাই এই নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের শিক্ষা কমিশন এই ধরনের পাঠক্রমের ত্রুটি নির্ণয় করে পরিমার্জন, সংশোধন ও পরিবর্ধনের ওপর নানা নীতি ও নির্দেশিকা দান করেছেন। নীচে এইসব ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল—

(১) এই ধরনের পাঠক্রম বিষয়বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত থাকে। শুধু তাই নয় শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ে ও অনেক বিষয়বস্তুর ওপর জ্ঞান অর্জন করতে হয়। ফলে বেশিরভাগ সময় শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ অনুভব করে।

(২) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকের গুরুত্ব ও প্রাধান্য অনেক বেশি। শুধু তাই নয় এখানে বিষয় নির্বাচন ও উপকরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর চেয়ে পাঠক্রমের নীতি নির্ধারক বা উপকরণ নির্মাতাদের পছন্দ ও অপছন্দের গুরুত্ব বেশি। ফলে অনেকসময় এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর মনের মতন হতে পারে না।

(৩) এই পাঠক্রমে ছাত্রদের বিষয়বস্তু জানা ও মনে রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়। ফলে এর মূল্যায়ন ছাত্রের স্মৃতিশক্তি ও বৌদ্ধিক বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। ফলে এই ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর সামাজিক ও মানসিক অবস্থার মূল্যায়ন সম্ভব হয় না।

(৪) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমে পৃথক পৃথক বিষয়বস্তুর জ্ঞানের ওপর অনেক জোর দেওয়া হয়। কিন্তু পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞানের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা জানানোর সুযোগ

কম। ফলে জ্ঞানগুলোর মধ্যে মৌলিক চিন্তার যে সমন্বয় রয়েছে সেটা না জানায় তাদের মানসিক ক্লান্তি আসে ও অহেতুক মানসিক ক্ষমতার অপচয় হয়।

(৫) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমে সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ও পূর্বনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার বিন্যাস থাকায় ছাত্রদের প্রয়োজন বা শিক্ষকের ক্লাস চলাকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কার্যক্রমের পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের সুযোগ কম। শুধু তাই নয় পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অনেক সময় ছাত্রের ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। ফলে অনেক সময় মানবসম্পদ উন্নয়নে ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকরী হতে পারে না।

(৬) এই পাঠক্রম একটি প্রাচীন, ভ্রান্ত ও অধুনাবর্জিত মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও শৃঙ্খলাতত্ত্ব (Theory of formal discipline)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(৭) এই ধরনের পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর নিজস্ব জন্মগত ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ কম। সকল শিক্ষার্থীকে পূর্বনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে একই পথ অনুকরণ করে জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা অর্জনে জোর দেওয়া হয়।

(৮) গতানুগতিক পাঠক্রম অর্জিত তাত্ত্বিকজ্ঞানের সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক জ্ঞানের সংগতি বিধানে বহুলাংশে অক্ষম। ফলে এই পাঠক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ফলাফল পরবর্তী কর্মজীবন ও বাস্তব জীবনের সফলতার নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

(৯) গতানুগতিক পাঠ তাত্ত্বিকজ্ঞান ও তার প্রকাশ করার দক্ষতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। সেই তুলনায় শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ও উন্নয়নের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এইসব বৃত্তিই শিক্ষার আর্দশ লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার জন্য অত্যন্ত জরুরি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে।

(১০) এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর মনকে বিশেষ আমল না দিয়ে তাকে জ্ঞান আহরণে বাধ্য করা হয়। আজকাল দেখা যাচ্ছে এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার চেয়ে প্রোফেসন কোর্সে ভর্তির দিকে মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ ঝোঁক। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা ভাবে যে গতানুগতিক পাঠক্রমে ভারাক্রান্ত শিক্ষা তাদের দীর্ঘ অধ্যবসায় ও সময়ের অপচয় ঘটায়।

৬.৮.২ কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম (Activity Centred Curriculum)

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনার ফলে শিক্ষাবিদদের নজর কাড়ে কর্মকেন্দ্রিক বা কর্মভিত্তিক পাঠক্রম। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম শিক্ষা সক্রিয়তা নীতির ভিত্তিতে প্রস্তুত। শিক্ষাবিদরা মনে করেন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জীবন ও জীবিকাতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে পাঠক্রমের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা। এই ধরনের পাঠক্রমকে জ্ঞানমূলক বিষয়ে ভারাক্রান্ত না করে বিভিন্ন শিক্ষাবিদরা ধারাবাহিক উদ্দেশ্যমুখী বাস্তব কর্মশিক্ষার ওপর বিশেষ নজর দিয়ে থাকেন। পাঠক্রমে কর্মকে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

রুশো (Rousseau), মন্তেসরি (Montesori), ডিউই (Dewey), গান্ধীজি (Gandhiji) প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষীগণ কর্মকেন্দ্রিক পাঠরচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের মতে এই কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম শিক্ষার্থী ও সমাজের কাছে অনেক বেশি কাঙ্খিত পাঠক্রম। জন ডিউই-এর মতে কর্মের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিজীবনে গতি সঞ্চার হয়। আর শিক্ষার্থীর গতিশীল জীবনই তাকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ জোগায়। গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষার প্রকল্পে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে। গান্ধীজি এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, "আমার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর হাত গতানুগতিকভাবে লেখা শুরু করার আগে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করবে ; শিক্ষার্থীর চোখ পরিস্থিতি ও পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস জানার সঙ্গে সঙ্গে ছবি, অক্ষর ও শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রম হবে শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে পৃথক নয়। এই পরিবেশই তাকে সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ নাম ও শব্দের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেবে। তাই ছাত্রের চাহিদা ও সামাজিক চাহিদার সমন্বয়ে পাঠক্রম প্রস্তুত হওয়া দরকার। জন ডিউই-এর মতে কর্মভিত্তিক পাঠক্রম শিশুর আবেগ, অনুভব ও চাহিদার ভিত্তিতে হওয়ায় এই ধরনের পাঠক্রম শিশুদের বিকাশে সবচেয়ে উপযোগী পাঠক্রম।

শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্ঞানমূলক, সমাজশিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক সবরকম কাজকর্মকেই এই পাঠক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ধরনের পাঠক্রম

প্রস্তুতির সময় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও চাহিদা-এর সঙ্গে সামাজিক চাহিদার কার্যকরী সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। এই সমন্বয় ঘটানোর জন্য পাঠক্রমের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন ঃ

(১) পাঠক্রমে কর্মগুলি এমন হবে যা শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়তা করবে।

(২) নির্ধারিত কর্ম ও অভিজ্ঞতা যেন শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তর বা পর্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে।

(৩) বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণ করা।

(৪) কর্মগুলি যেন শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও শিক্ষামূলক হয়।

(৫) অল্প সাহায্য নিয়ে ছাত্ররা নিজেরাই যেন কর্মগুলি করতে পারে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে যে ধরনের বিষয়বস্তু পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা নীচে দেখানো হল—

কর্মের শ্রেণি বিভাজন	আধুনিক ধারণা
১। দৈহিক বিকাশের কার্যাবলি।	১। স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ, খেলাধুলা, ব্যায়াম ইত্যাদি।
২। প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের কাজ।	২। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, ভ্রমণ, সমীক্ষা করা ইত্যাদি।
৩। গঠনমূলক ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির কাজ।	৩। হাতেকলমে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, পরীক্ষানিরীক্ষা করা, কারুশিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি।
৪। সৃজনমূলক ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধির কাজ।	৪। রচনা লেখা, ছবি আঁকা, কবিতা ও সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি।
৫। সামাজিক বিকাশ ও যোগাযোগ বৃদ্ধির কাজ।	৫। দলবদ্ধ কাজ, চিঠি লেখা, সমাজসেবামূলক কাজ ইত্যাদি।

কর্মভিত্তিক পাঠক্রমের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা ঃ

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম যদিও বিশেষভাবে সমাদৃত তবুও এ পাঠক্রম ত্রুটিমুক্ত নয়। এ শিক্ষায় নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি দেখা যায়—

(১) এই পাঠক্রমে কর্মসম্পাদনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় বলে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ অনেক সময় ব্যাহত হয়।

(২) অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানকে কর্মে রূপান্তর করা যায় না। তাই কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম সকল ধরনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

(৩) কোন বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তাই স্বল্পমেয়াদি শিক্ষা কার্যক্রমে এই পাঠক্রমের ব্যবস্থাপনা করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তা ছাড়া কর্মের ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জন করতে হয় বলে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি খুব ধীরগতিতে চলে।

(৪) কর্মভিত্তিক পাঠক্রমে শিক্ষার্থীকে একজন শিক্ষকের সহযোগিতায় কর্মসম্পাদন করতে হয়। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্রকে কর্মসম্পাদন করার জন্য নির্ধারিত করা হয় তারা অনেকেই বেশিরভাগ সময় শিক্ষকের প্রত্যক্ষ নির্দেশদান ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে সবসময় এই পাঠক্রম প্রয়োগ করার অসুবিধে রয়েছে।

(৫) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের সাহায্য উচ্চশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ ও গবেষণামুখী কার্যক্রমে সংগঠিত করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ এই পাঠক্রম নীচু ক্লাসে কার্যকরী হলেও উচ্চশিক্ষায় প্রযোজ্য নয়।

(৬) মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক ঐতহ্যকে বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু কর্মভিত্তিক পাঠক্রমে সাধারণত এই দুই গুরুত্ব উপাদানকে বাদ দিয়েই শিশুর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে কর্মসম্পাদন করার ওপর জোর দেওয়া হয়। ফলে কর্মভিত্তিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতিবান করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দর্শায়।

৬.৮.৩ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম (Experience Curriculum)

যে পাঠক্রম বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে থাকে তাকেই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম বলা হয়। এই ধরনের পাঠক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়মূলক তথ্য আহরণ বা কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা। শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে

সংগতি রেখে এখানে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির এবং অভিজ্ঞতা অর্জনে জোর দেওয়া হয়। ফলে পাঠক্রমে এমনভাবে উপাদান নির্বাচন করা হয় যাতে করে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা ঘটে। এইসব অভিজ্ঞতাগুলিই শিক্ষার্থীকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বাস্তবজীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির জ্ঞান, আবেগ ও সঞ্চালনমূলক আচরণের সার্বিক বিকাশ ঘটানো। তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সঞ্চালনমূলক প্রতিক্রিয়া ও আচরণে গুরুত্ব দেওয়া। ফলে উপাদান নির্বাচন করার সময় লক্ষ্য রাখা হয় যে উপরোক্ত তিনশ্রেণির আচরণের কোনো একটি বা সব কটির বাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠক্রমের সাহায্যে সুপরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করা যায়। শিক্ষার্থীর বয়স, ক্ষমতা ও চাহিদার এইসব নানা অভিজ্ঞতার বিন্যাস পাঠক্রমে করার চেষ্টা হয়। তাই এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে দর্শন, নৈতিকজ্ঞান ইত্যাদি উপাদানের বিন্যাস ঘটানো হয়। কর্মসম্পাদনের অভিজ্ঞতার জন্য পাঠক্রমে সাজানো হয় নানারকম প্রযুক্তির ব্যবহার, পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা, চারুকলা বিষয়ক নানান বিষয়বস্তু। এই সমস্ত ধারণাগত ভিত্তিকে সামনে রেখে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলি হল—

(১) পাঠক্রমে নির্বাচিত উপাদান শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে ও কার্যকরী সমন্বয় ঘটায়।

(২) নির্বাচিত অভিজ্ঞতাগুলি একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না। এইসব অভিজ্ঞতাগুলি শিশুর বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, কর্মসম্পাদন ও সঞ্চালনমূলক দক্ষতা বিকাশের উদ্দেশ্যে সম্পর্কযুক্ত।

(৩) শিক্ষার্থীর বয়স, চাহিদা, ক্ষমতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস করা।

(৪) এই ধরনের পাঠক্রমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (শিক্ষমূলক ভ্রমণ, সৃষ্টিমূলক কর্মসম্পাদন ইত্যাদি) ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা (পাঠ্যপুস্তক, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি)-র মাধ্যমে অভিজ্ঞতার কার্যকরী সমন্বয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই ধরনের পাঠক্রমে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে, প্রক্রিয়াগত দিক থেকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও কর্মভিত্তিক পাঠক্রমের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এই

পাঠক্রমে বাস্তব পরিস্থিতিতেও হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনে জোর দেওয়া হয়। তবে দুই পাঠক্রম দুটি ভিন্ন লক্ষ্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমে কর্মসম্পাদনের ওপর জোর দেওয়া হয়। এখানে কর্মসম্পাদনের নিপুণতা ও দৈহিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অর্থাৎ কর্মের ফলাফলের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কতটা জ্ঞান অর্জন করল বা তার প্রাক্ষোভিক আচরণ ও প্রায়োগিক দক্ষতা কতটা পরিবর্তিত হল সেটাই মূল্যায়ন করা হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় গতানুগতিক পাঠক্রম, কর্মভিত্তিক পাঠক্রম ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর তিনটি পর্যায় হিসেবে ধরা যেতে পারে। পরবর্তী অংশে তা আলোকপাত করা হল—

পাঠক্রমের নমুনা	লক্ষ্য
গতানুগতিক	জ্ঞান অর্জনে গুরুত্ব দেওয়া।
কর্মকেন্দ্রিক	কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা।
অভিজ্ঞতাভিত্তিক	বিষয়মূলক তথ্য আহরণ বা কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

তাই গতানুগতিক ও কর্মভিত্তিক পাঠক্রমের লক্ষ্যের ভিত্তিতেই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের লক্ষ্য ও উপাদান নির্মাণ করা যেতে পারে। আর এই দুই পাঠক্রমই অভিজ্ঞতাভিত্তিক, পাঠক্রম দুটি প্রারম্ভিক পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

পাঠক্রম
- প্রথম পর্যায় → বিষয়বস্তুর মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ
- দ্বিতীয় পর্যায় → কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন
- তৃতীয় পর্যায় → অভিজ্ঞতা অর্জন

● অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের উপযোগিতা (Utility of Experience Curriculum)

(১) এই পাঠক্রমের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক বা কর্মকেন্দ্রিক উভয় পাঠক্রমকে সাহায্য করা সম্ভব।

(২) এই পাঠক্রমে শিক্ষার মূল তত্ত্ব ও মনোবৈজ্ঞানিক নীতি উভয়ের মধ্যে সংগতি বিধান করে উপাদান চয়ন ও বিন্যাস করা হয়। তাই বাস্তবজীবনে এর গুরুত্ব অনেক বেশি।

(৩) অভিজ্ঞতাধর্মী পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক

বিকাশে সমগুরুত্ব আরোপ করে ফলে এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে অনুঘটক হিসেবে বিশেষ কার্যকরী।

(৪) এই পাঠক্রমে পঠনপাঠন, চোখে দেখা, কানে শোনা, হাতের কাজ ইত্যাদির সুযোগ থাকে বলে একইসঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ রয়েছে।

● **অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Experience Curriculum)**

(১) অনেকক্ষেত্রেই পাঠক্রমের প্রত্যাশিত লক্ষ্যের থেকে বাস্তবে অর্জিত লক্ষ্যের মধ্যে ব্যবধান দেখা যায়। যেমন শিক্ষা কর্মসূচির ফলাফল সম্বন্ধে আগাম নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বাড়িতে প্রতিদিন টিভি দেখার পর একটি শিশুর মনে কী অভিজ্ঞতা অর্জন বা প্রতিক্রিয়া হল তা যেমন জানা যায় না, তেমনি পাঠক্রমের তথ্যের বা কর্মসম্পাদনের ফলাফল সম্বন্ধে আগে থেকে কিছু বোঝা যায় না।

(২) এই পাঠক্রমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম এত বেশি সময় নেয় যে সীমিত সময়সীমার শিক্ষণ কার্যক্রমে এই ধরনের পাঠক্রম সংগঠিত করা সম্ভব হয় না।

(৩) এই পাঠক্রমের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা যায়। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় যেখানে অনেক শিশুকে কাগজেকলমে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় সেখানে অভিজ্ঞতাধর্মী পাঠক্রমের বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার ফলাফল যাচাই করা সম্ভব হয় না।

৬.৮.৪ অবিচ্ছিন্ন এবং সমাকলিত পাঠক্রম (Undifferentiated and Integrated Curriculum)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় গতানুগতিক, কর্মকেন্দ্রিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম কোনোটাই এককভাবে শিক্ষার প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। শিক্ষার মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যেমন জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করার দরকার, তেমনি সেই জ্ঞান কর্ম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগঠিত হলে শিক্ষার্থী সহজেই শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। তাই আধুনিক বহু শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাকমিশন এই তিন ধরনের পাঠক্রমের কার্যকরী সমন্বয় ঘটানোর ওপর জোর দিয়েছেন। এই ধরনের সমন্বয়ী পাঠক্রমকে অনেকে সমাকলিত বা Integrated পাঠক্রম বলেন। পাঠক্রমের লক্ষ্য হল বিষয়বস্তুর ভার থেকে পাঠক্রমকে মুক্ত করা এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা, ক্ষমতা ও শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জ্ঞান, তথ্য, কর্ম ও অভিজ্ঞতাকে সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনা করা। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও আদর্শ জীবনযাপনের লক্ষ্যে এখানে অবিচ্ছিন্ন ও সহায়ক জ্ঞান, কর্ম ও অভিজ্ঞতা উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

এই সমন্বয়ী পাঠক্রমের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়বস্তু যেন বিচ্ছিন্নভাবে না থাকে। গতানুগতিক

পাঠক্রমের বিচ্ছিন্নতা দূর করাও এই পাঠক্রমের বিশেষ লক্ষ্য। এখানে বিষয়বস্তু পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন না করে বিষয়ের বাস্তব ও মৌলিক ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই চিন্তাধারার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—মানবসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও সমাজসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। এই তিন অভিজ্ঞতার কথা ভেবে অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমে সাহিত্য, কলা, দর্শন ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানবীয় বিজ্ঞানে, যেমন রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তেমনি, আবার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরবিদ্যাকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে সমাজবিজ্ঞানে। এই সমন্বয়ী নীতির ওপর ভিত্তি করেই অবিচ্ছিন্ন বা কেন্দ্রায়িত পাঠক্রম (core curriculum) প্রস্তুত করা হয়। অনেক শিক্ষাবিদ এই পাঠক্রমের সংজ্ঞা দেওয়ার সময় বলেছেন—যে পাঠক্রমে কোনো বিশেষধর্মী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না তাকেই অবিচ্ছিন্ন বা কেন্দ্রায়িত পাঠক্রম বলা হয়। এই পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য হল—

(১) অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমে নির্বাচিত বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হয়। তবে কোনো বিশেষধর্মী (specialization) জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না।

(২) অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সহগামিতা নীতির (principles of correlation) ভিত্তিতে উপস্থাপনা করা হয়। তাই পাঠক্রমে সহগামিতা বা মৌলিক সম্পর্কযুক্ত উপাদান হিসেবে তিনটি বিষয় যেমন উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীরবিদ্যার সমন্বয়ে স্কুলের পাঠক্রমে জন্ম হয়েছে জীবন বিজ্ঞানের (Life Science)।

(৩) এই পাঠক্রমে ছাত্রদের সাধারণ বুদ্ধি (g-factor) ও চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতা নির্বাচন করা হয়। ফলে সকল ছাত্রকেই একই পাঠক্রম বিষয় অনুশীলন করতে হয়। এই ধরনের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত হয় মাধ্যমিক স্তরের কেন্দ্রায়িত বিষয় (core subject)।

(৪) সহগামিতার নীতিতে যে কেন্দ্রায়িত পাঠক্রম প্রস্তুত হয় সেখানে বিশেষধর্মী (specialization) -এর গুরুত্ব থাকে না। ফলে এই পাঠক্রম উচ্চশিক্ষার 'বিশেষধর্মী যে পাঠক্রম থাকে তার প্রারম্ভিক পর্বের সোপান হিসেবেই শুধুমাত্র প্রাধান্য পায়। এই পাঠক্রম উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

(৫) অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উপযোগিতার কথা চিন্তা করে বিষয়বস্তু মূলত মানবাত্মক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও সামাজিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি অনুযায়ী উপস্থাপনা করা হয়।

● **অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের উপযোগিতা (Utility of Undifferentiated Curriculum)**

(১) এই পাঠক্রম বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়সাধন করে ফলে শিক্ষার্থী স্বল্পসময়ে একই সঙ্গে অনেক ধরনের জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হয়।

(২) এখানে বিষয়বস্তু মৌলিক ধারণাগত ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ফলে শিক্ষার্থীর অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি অনেক বেশি।

● **অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Undifferentiated Curriculum)**

(১) সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক ধারণা, পরিধি, মূল উপাদান ইত্যাদির। তাই বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে মিল খুঁজে তাকে ভিত্তি করে পাঠক্রম প্রস্তুত করা সবসময় সম্ভব হয় না আর হলেও অনেক সময় সেই সমন্বয় শিক্ষার্থীর নিকট বোধগম্য হয় না।

(২) অনেক সময় অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমে কৃত্রিম সমন্বয়নের চেষ্টার ফলে শিক্ষার্থীর মনে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।

(৩) কেন্দ্রীয় পাঠক্রমের মাধ্যমে পাঠক্রমে যে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয় তা অনেক সময় শিক্ষার্থী মানসিকভাবে গ্রহণ নাও করতে পারে।

৬.৮.৫ জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম (Life Centred Curriculum)

শিক্ষার্থী বা শিশুর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে পাঠক্রম তাকেই বলা হয় জীবনভিত্তিক বা জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা। শিক্ষাবিদরা দেখেছেন পাঠক্রম শুধু গতানুগতিক, কর্মকেন্দ্রিক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক, সমাকলিত বা অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম না করে শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়াই একান্ত প্রয়োজন। এই ধরনের শিক্ষা যে একদিকে শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক ধারণাকে চরিতার্থ করতে সাহায্য করে তেমনি এ শিক্ষা দার্শনিক তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ণেও সহায়ক। অর্থাৎ জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম শিক্ষার দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার লক্ষ্যের কার্যকরী সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করে।

শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো। আর শিক্ষার সুদূর প্রসারী বা চরম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির কল্যাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে ব্যক্তিকল্যাণ ও সমাজকল্যাণ উভয় ধরনের কল্যাণের কামনা বর্তমান। আবার ব্যক্তির উন্নয়ন নির্ভর করে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা, দক্ষতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে জড়িত। তাই শিক্ষার যথার্থতা নির্ভর করবে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু যদি জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। তাই জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমের লক্ষ্য ব্যক্তির জীবনের উন্নয়নের সঙ্গে বর্তমান পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ জীবনের নানান অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা ও সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জীবনের উদ্দেশ্যে ও জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে শিক্ষা-পাঠক্রম তাকেই জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম বলা হয়। জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

(১) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর চাহিদা পরিতৃপ্ত করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ফলে পাঠক্রমের উপাদানগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদাভিত্তিক বেছে নেওয়া হয়।

(২) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমে অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে থাকবে যা শিক্ষার্থীর জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর যা শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে। এ ধরনের পাঠক্রম তখন পড়ুয়ার কাছে বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

(৩) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম একদিকে যেমন ব্যক্তি জীবনের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করবে, তেমনি এর উপাদান আবার সামাজিক চাহিদাকেও পরিতৃপ্ত করবে। এই ধরনের উপাদান ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে সামাজিক জীবনের মেলবন্ধন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে তার সামাজিক অভিযোজনে সাহায্য করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষার্থীর জীবনের উন্নয়ন ও জীবনযাপনের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পাঠক্রমের উপাদানগুলোর নির্বাচন ও সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস করার ওপর শিক্ষাবিদরা বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে পাঠক্রমে যেসব উপাদান যুক্ত করার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয় সেগুলিকে তিনশ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) শিক্ষার্থীর বয়স ও পরিণতমনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানসিক ও দৈহিক বিকাশের উপযোগী উপাদান।

(২) মৌলিক চাহিদা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও প্রবণতার কথা চিন্তা করে জীবনযাপন ও জীবনবিকাশের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতার সংযোজন।

(৩) শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ ও অভিযোজনের সাহায্যে সমাজের গুণগতমান উন্নয়নের উপাদান।

৬.৯ শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের ভূমিকা (Role of Curriculum in Education)

পাঠক্রম শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাঠক্রমের কাজ হল শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করা। পাঠক্রমই ঠিক করে দেয় কী পড়ানো হবে আর কীভাবে পড়ানো হবে। কী উপকরণ লাগবে বা কীভাবে মূল্যায়ন হবে। অর্থাৎ শিক্ষার গতিপ্রকৃতি ও কার্যসূচি সবই নির্ভর করে থাকে পাঠক্রমের ওপর। অর্থাৎ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়দিক থেকে শিক্ষা কার্যক্রমে পাঠক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। পাঠক্রমই শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও কার্যকারিতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে প্রভাবিত করে।

পাঠক্রমের সাহায্যে শিক্ষার দার্শনিক, সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির কার্যকরী সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা হয়। ফলে পাঠক্রম রচনার উদ্দেশ্য ও শিক্ষার মূল লক্ষ্য কার্যত অভিন্ন। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর জীবনে উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের ও জাতির উন্নয়ন ঘটানো। এই উন্নয়নের গতিশীলতা ও গুণগতমান নির্ভর করে শিক্ষাকর্মসূচির পাঠক্রমের ওপর। তাই পাঠক্রম শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনার মূল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষার্থীর বাস্তবজীবন ও জীবিকার সঙ্গে তার পাঠক্রম যদি সংযুক্ত হতে না পারে তাহলে সেই পাঠক্রম তেমনভাবে সর্বজনীন আবেদন রাখতে পারে না। তাই আধুনিক পাঠক্রমের লক্ষ্য যেমন বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিকজ্ঞান পরিবেশনের সঙ্গে সমাজ ও শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী কর্মদক্ষতা, অভ্যাস ও আদর্শ চরিত্র গঠনে সহায়তা করা তেমনি স্বশিক্ষণ (self-learning) জীবিকা অর্জন ও গবেষণার কাজে সাহায্য করা। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পাঠক্রমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রমের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে নির্দেশ দান করা। তা ছাড়া মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে তা পাঠক্রমে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া

থাকে। শুধু তাই নয় ছাত্রদের নিজেদের প্রগতি জানার জন্য স্বমূল্যায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা পাঠক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। অর্থাৎ শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিক্ষণপদ্ধতি, উপকরণ প্রস্তুতি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এইসব নানা স্তরে পাঠক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

৬.১০ উপসংহার (Conclusion)

ওপরের আলোচনা থেকে জানা যায় শিক্ষা কার্যক্রমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পাঠক্রম। উপযুক্ত পঠনপাঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পাঠক্রমে সুপরিকল্পিতভাবে বিষয়বস্তু, উপকরণ, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদির কার্যকরী সমন্বয় ঘটানো হয়। এই পাঠক্রমের দুটি প্রধান ধাপ হচ্ছে পাঠ ও পাঠ্যসূচি। পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও আধুনিক জীবনধারার বিচিত্র প্রয়োজনে শিক্ষার লক্ষ্যের নানা বিবর্তন ঘটেছে। সেই অনুযায়ী পাঠক্রম রচনা ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে নানা প্রকারের পাঠক্রম—গতানুগতিক, কর্মকেন্দ্রিক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক, সমাকলিত ও জীবনভিত্তিক পাঠক্রম ইত্যাদি প্রস্তুত হয়েছে। এইসব পাঠক্রমের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের যেমন কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তেমনি নানা প্রকারের পাঠক্রমে কিছুটা সাধারণ গুণাবলি রয়েছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতা অনুযায়ী এইসব পাঠক্রমের শিক্ষা কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

৬.১১ প্রশ্নাবলি (Questions)

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay type Questions)

১। পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিন। পাঠক্রম বলতে কী বোঝায় তা বিবৃত করুন।

২। ব্যাপক অর্থে পাঠক্রম বলতে কী বোঝায়? পাঠ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৩। পাঠক্রমের প্রধান প্রকারভেদগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা করুন। এই পাঠক্রমের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

৫। কর্মকেন্দ্রিক ও বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রমের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬। অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম কী? এই পাঠক্রমের উপযোগিতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

১। জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম।

২। শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের ভূমিকা।

৩। অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের উপযোগিতা।

৪। পাঠক্রমের আধুনিক ও প্রাচীন ধারণা।